



বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা সময়ের দাবি

মু. মিজানুর রহমান মিজান

এভাবে আলাদা
আলাদা করে পরীক্ষা
নিলে বাংলাদেশের
প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে
মেধা মূল্যায়ন করে
বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য
শিক্ষার্থী সংগ্রহ করা
সম্ভব নয়। এই
সমস্যার সমাধান সম্ভব
যদি সমন্বিত
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক
হয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে
একটিমাত্র ভর্তি
পরীক্ষা নেয়

প্রতি বছরের দ্বিতীয় অংশ জুড়ে আমাদের দেশে চলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম। সাধারণ থেকে বিজ্ঞ মহল একে যুক্তির সঙ্গে তুলনা করে নাম দিয়েছেন 'ভর্তিযুদ্ধ'। ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে প্রেক্ষাপট শুরু করতে করতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরবর্তী বছরের দুই থেকে তিন মাসে মোট শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রতিষ্ঠান ভেদে কম-বেশি আট মাস মুছে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয় স্বল্পসংখ্যক আসনে হাজারো ভর্তিচ্ছুদের থেকে শিক্ষার্থী বাছাইয়ের জন্য। পাশাপাশি প্রকৃত মেধাবীরাই যাতে ভর্তি হতে পারে সে লক্ষ্যও থাকে। কিন্তু আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার ও প্রার্থী বাছাইয়ের কৌশল লক্ষ্য করি তবে তা যে সত্যিকার অর্থেই মেধার মূল্যায়ন সেটা জোর দিয়ে বলা সম্ভব নয়, আবার পুরোপুরি অস্বীকারও করা যায় না। তবে এ সুযোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা কোটিং সেন্টারগুলো ব্যবসাসিঁটা বেশি ভালোই জমে ওঠে। ভর্তি পরীক্ষা হয় কতগুলো বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমন্বিত উত্তর দেওয়ার জন্য থাকে ও এমআর শীট যা আমরা সবাই জানি। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য গড়ে এক মিনিট থাকে না। ভুল উত্তরে সঠিক উত্তর হতে প্রাপ্ত নম্বর থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ কেটে নেওয়া হয়। সহজ ও কঠিন মিলিয়েই প্রশ্ন থাকে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থী বাছাইয়ে শুধুমাত্র কতগুলো 'বহু নির্বাচনী প্রশ্ন' কতটা যৌক্তিক, যেখানে একেকজন শিক্ষার্থী ১২টি বছর পড়াশোনা করে এসেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তারা একাডেমিক পড়াশোনার পাশাপাশি ছোট ছোট গবেষণা কর্মে মগ্ন থাকবে ও নিজ নিজ সৃজনশীলতার বিস্তার ঘটাবে? প্রশ্নটি থাকলো দেশের শিক্ষক, শিক্ষাবীদ, শিক্ষা গবেষক, শিক্ষাকর্মী, শিক্ষার্থী মহলসহ সংশ্লিষ্ট সকল ও সাধারণ মানুষদের কাছে যারা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে একটু হলেও চিন্তা করে থাকেন।

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৪০টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে রয়েছে (সূত্র: ইউজিসি ওয়েবসাইট)। ভর্তির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিতেই একই রকম সূত্র ব্যবহার করা

হয়ে থাকে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই আলাদা আলাদা দিনে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে থাকলেও, আজ একটিতে পরীক্ষা দিল তো কাল আবার আরেকটিতে দিতে যথাসময়ে পৌঁছানোর জন্য বেশ তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকতে হয় যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায়। প্রাপ্ত পাড়ি দিতে হয় কখনও নদীপথে, কখনও সড়কপথে আবার কখনও রেলপথে। প্রায় একটা লম্বা সময় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের পথে পথেই কাটাতে হয়। এতে না হয় ঠিকমত ঘুম, না থাকে গোসল, না থাকে ঠিকমত খাওয়া। অনেকেই অনভ্যস্ততার কারণে স্বাস্থ্যগত সমস্যা পড়ে থাকে। এমন একটি বেরসিক ভ্রমণে তুলনামূলক মেয়ে ভর্তিচ্ছুদের একটু বেশি সমস্যা পড়তে হয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনানুকূলে থাকার কারণে

হোক, শুধু একটি প্রশ্নপত্রে কয়েকটা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন মেধাবীদের খুঁজে পেতে সহায়ক নয়; যাদের মুখস্থ বিন্দ্য রয়েছে তারাই ভালো করতে পারে। কোনো কিছু মুখস্থ রাখতে পারাটাও এক ধরনের ট্যালেন্ট কিন্তু সৃজনশীলতার প্রশ্নে এটি কিঞ্চিৎ সত্য। এমনও হয়, প্রশ্নগুলো কোনো না কোনো গাইড বই থেকে কপি করা হয়, এর জন্য বিশেষ কোনো প্রমাণের দরকার হয় না।

বাংলাদেশের মানুষের সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা কেমন তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। যে শিক্ষার্থীর অভিভাবক ঠিকমত স্কুল-কলেজের বেতন ও পরীক্ষার ফি দিতে পারেনি তারও একই সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ফর্ম (ইউনিট ভিত্তিক), যাতায়াত, কোচিং ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ হাজার হাজার টাকা চলে

মনে হয় না এটি খুব একটি বামেলার হবে যেহেতু বর্তমান সরকার দেশের আইসিটি খাতকে অনেক অনেক সমৃদ্ধ করেছে।

একটি জিনিস মনে রাখতে হবে সরকার আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে প্রচুর টাকা ব্যয় করছে বা ভবিষ্যতেও করার চিন্তা রয়েছে। সুতরাং আমাদের মত তৃতীয় বিশ্বের একটি টাকাও যাতে অপাত্রে প্রদান না করা হয় সেদিকে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে; এ শুধু শিক্ষাখাতে নয়, সর্বক্ষেত্রে।

আমরা বরাবরই শুনে আসছি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান অভিযোগ দেশের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা খুবই দুর্বল, এখানে ঠিকমত শিক্ষার্থীদের পড়ানো হয় না, শিক্ষকেরা মানসম্মত নয় যার কারণে প্রতিবছরই ভর্তি পরীক্ষায় অধিকাংশই পাস করতে পারে না।



গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখেও অভিভাবক কিংবা অভিভাবকত্ব কাউকে সাথে থাকতে হয়ই। অনিবার্য কারণবশত ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরিবর্তন হলে কিংবা গৃহীত পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেলে তাতে বিড়ম্বনার মাত্রা বেড়ে যায়। আসলে কে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাবে সেটা আগে থেকেই বলা যায় না বলেই সকলকে এমন করণ অধ্যায় পার করতে হয়।

দেখা যায়, একটা ছেলে বা একটা মেয়ে খুবই ভালো পড়াশোনা করেছে বেসিরভাগ প্রশ্নের উত্তরই তার জানা, সৃজনশীলতায় অন্যতম সেরা কিন্তু হঠাৎ এরকম অনভ্যস্ততার চাপে শরীর খারাপ হয়ে গেল বা মানসিক চাপে পড়ে গেল, এতে করে পরীক্ষাটা একটু খারাপ হয়ে থাকে যা স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক জিনিসটিই অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায় যখন ওই ছেলেটি বা মেয়েটি ভর্তির সুযোগ পায় না, শোধরানোর সুযোগটিও নেই যেহেতু এই পরীক্ষা দেবার সুযোগ এখন একবারই পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীকে অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় হাজির হতে হবে বলে একাধিক পরীক্ষা নেওয়ারও সুযোগ নেই। তাহলে তা দেখা যাচাই, মুখস্থ বিদ্যার যাচাই কিংবা সৃজনশীলতা যাচাইয়ের প্রশ্নসন যা হোক না কেন, সেটা কতগুলো 'বহু নির্বাচনী প্রশ্নের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অনেকেই বলে থাকেন এসব পরীক্ষা নেওয়া হয় শুধু কিছু অর্থের জন্য। প্রমাণ হিসেবে তারা পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা, অনুপযুক্ততা এবং পরীক্ষার্থী পিছু ব্যয়তিরিক্ত ফি নির্ধারণের কথা তুলে ধরেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হওয়া ও পরীক্ষা কক্ষে অসদুপায় অবলম্বনেরও অভিযোগ থাকে যার প্রমাণ রয়েছে দেশের গণমাধ্যমে ও পুলিশের খাতায়। আর যা-ই

যায় যা নিম্নবিস্তৃত ও নিম্ন-মধ্যবিস্তৃত পরিবারের জন্য যোগ্যতা করা কষ্টসাধ্য। তবু তারা আশার বাজি রাখেন নিয়তির ওপর যে তাদের সন্তান, ভাইবোন কিংবা নিকটজন বড় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবে, ভালো একটি বিষয়ে পড়বে আর পড়াশুনা শেষে ভালো কিছু করবে যা পরিবার-সমাজ-দেশের জন্য মঙ্গলজনক। কিন্তু কতজন এই নিয়তির বাজিতে জয়ী হতে পারে? আবার গোবরে পশুফুল ফোটান মতোও নজির খুঁজেই অসংখ্য, যদিও দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে গ্রামের দরিদ্র মানুষের মেধাবী সন্তানরা এখন পিছিয়ে পড়ছে।

এভাবে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা নিলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সঠিকভাবে মেধা মূল্যায়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্থী সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান সম্ভব যদি সমন্বিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক হয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে একটিমাত্র ভর্তি পরীক্ষা নেয়। পরীক্ষা পদ্ধতিতেও মেধা মূল্যায়নের সর্বোচ্চ সংখ্যক উপাদান থাকতে হবে যেমন-বহুনির্বাচনী, লিখিত এবং সাক্ষাৎকার। এছাড়াও ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক সামর্থ্যও যাচাই করার প্রয়োজন রয়েছে। যে যেই ডিসিপ্লিনে শিক্ষার্জন করবে সে যেন সংশ্লিষ্ট ওই বিষয়ের ওপরই দেশকে তার সার্ভিস দিতে পারে সে জন্যই মুখস্থ রাখতে পারার সক্ষমতা, সৃজনশীলতা, মননশীলতা, বিচক্ষণতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে শারীরিক সামর্থ্যেরও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। সারাদেশে একযোগে এবং একই প্রশ্নে পরীক্ষা নিতে হবে কিন্তু মেধাক্রম অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিষয় বন্টন এবং প্রত্যেকেরই সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দের তালিকায় রাখার সুযোগ রাখতে হবে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন যখন কোনো না কোনো গাইড বইয়ের সঙ্গে হুবহু মিলে যায় তখন কি আমরা সাধারণ মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি না? আমরাতো এমন চিত্র প্রতিবছরই দেখি। আবার প্রশ্নের ধরনের কারণেও খানিকটা মিলে যাওয়া স্বাভাবিক। আমরা জানি আমাদের দেশের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষকের অভাব রয়েছে, তাই বলে উচ্চশিক্ষা স্তরেও এমন হবে সেটা মানতে কষ্ট হয়। যাহোক আক্ষেপ থেকে অনেক কিছুই বলা যায় কিন্তু শিক্ষকদের নিয়ে সমালোচনাতো দূরে থাক সামান্য মন্তব্য করারও যোগ্যতা আমার নেই। দেশে অনেক গুণী শিক্ষক রয়েছেন যাদের কারণেই শিক্ষার আলো জ্বলে আছে। আর এসব শিক্ষক কিন্তু একসময় ছাত্র ছিলেন, এটিও মনে রাখতে হবে।

কোয়ালিটি শিক্ষার দাবি কোয়ালিটি ভবিষ্যৎ বাস্তবায়ন সম্ভব যদি কোয়ালিটি সম্পন্ন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী থাকে। তাইতো শুধু বহুনির্বাচনী প্রশ্নে বসে না থেকে মূল্যায়নের চতুর্দিক ঘিরে নেয়া রাখতে হবে আর শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়েই গাইড বই নির্ভরশীলতা বাদ দিয়ে নিজের নিজস্ব বিজ্ঞানভিত্তিক সমগ্র বিশ্ব জ্ঞানমূলক জ্ঞান একটিমাত্র ভর্তি পরীক্ষার বন্ডে বন্ডে করতে হবে যার মূল পরিচালনার দায়িত্ব কোয়ালিটি শিক্ষার নিকট আর কেন্দ্রীয় শিক্ষকদের কাছ দিয়ে। এটি কি সমাধান দাবি নয়?

লেখক: শিক্ষার্থী শিক্ষা গবেষণা, সরকারি কার্যার্থে/আইসিটি চার্স টেনিং কলেজ, ঢাকা ইমেইল: mrmizan@gmail.com